আততায়ী

গত আট বছর ধরে প্রতিবছর বার্ষিক বসন্তোৎসবে হাজিরা দিয়ে এসেছেন তালুকদার, সেই প্রথম বসন্তোৎসবের পর থেকেই। প্রথমদিকে স্ত্রী সুপ্রভাকে নিয়ে আসতেন। সুপ্রভা গত হয়েছেন আজ সাড়ে চার বছর হয়ে গেল। তালুকদার নয়ডার সাবেক বাসিন্দা নন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর নয়ডার ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে উঠেছিলেন ঊনিশ বছর আগে। তাঁর বয়স তখন ষাঠ পার হয়ে গেছে। সুপ্রভার ছাপ্পান্ন। ছেলে জামশেদপুরে চাকরি করে। আগে নিয়মিত বাবা-মা'র কাছে আসতো। কখনো সপরিবারে, কখনো একা। ইদানীং একেবারেই আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেও প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে এখন। হাইপার টেনসন ও ডায়াবিটিসের রুগী। বৌমার শ্বাসকষ্ট আছে। জামশেদপুরে মোটামুটি ভাল থাকে, অন্য কোথাও গেলেই চাগিয়ে ওঠে। ফলে জামশেদপুরেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকে বৌমা। কোথাও যেতে চায় না।

তালুকদারের স্ত্রী গত হ'বার পর ছেলে হাবলু (ভাল নাম সমরজিৎ) বাবাকে বলেছিল জামশেদপুরে গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে। তালুকদার রাজী হননি। নেই নেই করেও গত ঊনিশ বছরে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অবসরপ্রাপ্ত দিনগুলো নতুন রঙেও সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে। সেদিক থেকে এই এলাকাটিকে অবসরপ্রাপ্ত লোকেদের জন্য আদর্শ বাসস্থান বলা যায়। উচ্চমধ্যবিত্ত পাড়া। বাসিন্দারা অধিকাংশই প্রৌঢ়। প্রায় সকলেই মোটা পেনসন পান। চাকরিজীবনেও বেশ কিছু টাকাপয়সা জমিয়েছেন। লাইব্রেরী, ক্লাব, মন্দির, মল, ডাক্তার-বদ্যি-হাসপাতাল সব কিছুই নাগালের মধ্যে। টাকা ফেললে জীবনধারণের সকল সাধনই পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে বাড়িতে বসেও পাওয়া যায়। এমন কি নগদ টাকাও বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে যায় কোন কোন ব্যাঙ্ক।

এই ফুলমেলাটা বছরে দু'বার হয়। একবার শুধু চন্দ্রমল্লিকার বাহার, দ্বিতীয়টা সর্বপ্রকার ফুলের সম্ভার। মেলায় ফুডকোর্টে কয়েকটা স্টল বসে। আমিষ, নিরামিষ, থালি, হালকা জলখাবার - সব রকম ব্যবস্থা থাকে। তালুকদার, মহান্তি, সান্যাল ও ফ্রান্সিস - এই চারজনে মিলে মেলা দেখতে এসেছেন আজ। তালুকদারের মত ফ্রান্সিসও বিপত্নীক। মহান্তির স্ত্রী আর্থরাইটিসে পঙ্গু। হাঁটাহাঁটির

ব্যাপারে থাকেন না। শুধু পার্টি, সিনেমা, তম্বোলায় শামিল হন। দুই একর জুড়ে ফুলের শোভা দেখে উল্লাসে আপ্লুত হওয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে। সান্যালের স্ত্রী সুস্থ-সবল কিন্তু তিনি কোথাও স্বামীর সঙ্গে যান না। পুজোমণ্ডপেও একদিন স্বামী ভোগ খেতে আসেন, পরদিন স্ত্রী আসেন। তিনটে দুর্গাপুজো হয় এপাড়ায়। তাই খুব একটা অসুবিধা হয় না ওদের। নিন্দুকের কথায় কান না দিলেই হল।

তালুকদার, মহান্তি, সান্যাল ও ফ্রান্সিস, এরা চারজনেই প্রবীণ। পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে বয়স। তালুকদার তিনমাস আগে আশিতে পা দিয়ে কুড়ি পারসেন্ট বাড়তি পেনসন পাচ্ছেন। আজকের লাঞ্চটা তালুকদারই খাওয়াচ্ছেন ওদের।

এবারকার ফুল-মেলায় ফুলের প্রদর্শনী ছাড়াও অনেক কিছু আছে। বনসাই, ইকেবানা, উদ্যান প্রেমীদের নিত্য ব্যবহারের সাজ সরঞ্জাম, হবু উদ্যানপ্রেমীদের জন্য চট্-জলদি প্রশিক্ষণ শিবির - এ সবের আলাদা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অডিটোরিয়ামে সারি সারি চেয়ার পাতা। শহরের নামী স্কুলগুলো থেকে বাছাই করা আইটেম দিয়েছে। অডিটোরিয়াম সরগরম করে স্টেজে অভিনেতা, গায়ক, বাদক, যাদুকর একটার পর একটা প্রোগ্রাম পরিবেশন করে চলেছে।

তবে এত সবের মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ফুডকোর্টে অন্যবারের মত চেয়ারের ব্যবস্থা নেই। হাতে প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হবে খদ্দেরকে।

তালুকদার চটে-মটে বল্লেন, "এর মানে কি? দোকানে থরে থরে খাবার সাজিয়ে রেখেছে। ও সব খাবে কে, খাবার জায়গার ব্যবস্থা না থাকলে?"

এটা তালুকদারের খানিক আগের উক্তি। এখন প্রোগ্রামের ইন্টারভ্যালে ভিড়ে ভরে গেছে ফুডকোর্ট। কাগজের প্লেটে করে যত রকম খাবার নিয়ে দিব্যি গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে সবাই, এতটুকু অসুবিধার জানান না দিয়ে।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলোকে অবলীলাক্রমে রাজস্থানী থালি, ইডলি-সাম্বার-চাটনি, মশালা-দোসা, রাজ কচৌরির আস্বাদ নিতে দেখে ফ্রান্সিস নিজের লাঠিখানা সামলে নিয়ে বললেন, "এ সব আমাদের জন্যে নয় ব্রাদার। আমাদের বাপ-দাদারা বুদ্ধিমান ছিলেন। ঠিক সময়ে সংসার থেকে সরে গিয়ে বানপ্রস্থ নিতেন। এসব ছেলেমানুষী আর আমাদের মানায় না।"

তালুকদার বললেন, "হোয়াট নন্‌সেন্স! এই কাছেই তো প্লাজা মল রয়েছে। চলো সেখানে গিয়ে কায়দা মাফিক লাঞ্চ খাবো আমরা। এরকম একপায়ে খাড়া

হয়ে খেতে বয়ে গেছে আমাদের।"

ফ্রান্সিস নিজের লাঠির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এক পায়ে নয়, তিন পায়ে।"

সান্যাল ছাড়া বাকি তিনজনের অবলম্বন লাঠি। তাদের মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠলো।

সান্যাল বিরক্ত মুখে বললেন, "আমি লাঠি ব্যবহার করছি না কারণ একেবারে ওয়াকার কিনবো। লাঠির খরচাটা বেঁচে যাবে।"

এঁরা কিন্তু সাধারণত বেশ হাসিখুশি থাকেন। বৃদ্ধত্ব বা অশক্ততার প্রসঙ্গ সচরাচর এঁদের কথাবার্তায় শোনা যায় না। ফুডকোর্টের অব্যবস্থা দেখেই হয়তো মেজাজ বেঠিক হয়ে গেছে এঁদের।

তালুকদার ট্যাক্সি ডাকলেন। প্লাজা মল একেবারে নাকের ডগায়। সেখানে না গিয়ে তালুকদার ড্রাইভারকে আড়াই তিন কিলোমিটার দূরে ওশেন প্লাজায় নিয়ে যেতে বললেন। সেখানে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নেমে সবাই বিশাল মলের ভিতর ঢুকলেন। এয়ার কন্ডিশন্ড বিল্ডিং'এর দরজায় সিক্যুরিটি চেক। পিঁ-পিঁ করে অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

রক্ষী ছেলেটি বদান্যতার হাসি হেসে বললো, "ঠিক আছে, যান।"

ওদের বার্ধক্য ও অশক্ততার জন্য ছেলেটির সুস্পষ্ট করুণাবোধ উপলব্ধি করে চারজনেরই মনে আবছা তিক্ততা ছেয়ে গেল।

সামনেই ভাদোরামের সুবিশাল রেস্তঁরা ও ক্যারি হোম কাউন্টার। ভিতরে ঢুকে প্রবেশ পথের পাশে প্রথম টেবিলটায় বসলেন ওঁরা। এদিকটায় তেমন ভিড় নেই। এখনও বেশ কিছু চেয়ার খালি আছে। হলের ভিতরে একেবারেই হাউস-ফুল। ভিতর দিকে অর্ধেক হল জুড়ে কোনও সংস্থার অনুষ্ঠান চলছে।

"ওদের দেখে তো হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী মনে হচ্ছে। বয়সে বড় ক'জন বোধহয় টিচার," মহান্তি মন্তব্য করলেন।

"কোনও স্পোর্টস টিম কিংবা অ্যামেচার ব্যাণ্ড-ও হতে পারে," বললেন ফ্রান্সিস।

"আজ শুধু কচি-কাচাদেরই ভিড় এখানে," বললেন সান্যাল, "আমরা বেমানান।"

"তা ঠিক। আমরা তো মালপত্তর বেঁধে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন এলেই

উঠে পড়বো।"

"তবে যদ্দিন আছি তদ্দিন আনন্দে কাটাতে চাই।"

"সেটাও কম কথা নয়। আমাদের দেখে ইয়ং জেনারেশন বুঝবে জীবন কত সুন্দর, কত মূল্যবান।"

সান্যালকে নিয়ে তালুকদার ফুড কাউন্টারে গেলেন খাবার আনতে। কাউন্টারে নগদ দাম চুকিয়ে ট্রে'তে খাবার নিয়ে নিজের টেবিলে এসে বসছে সবাই। সিনিয়ার সিটিজেনদের আলাদা কাউন্টার। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। টেবিলে খাবার পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট কর্মীরা। পাশের টেবিলের এক প্রান্তে বসা ছোকরাটি একমনে একটা খবরের কাগজ পড়ছে। বারোয়ারি খবরের কাগজ নয়, পাতাগুলো আকারে অনেক ছোট। সামনে এক কাপ কফি রাখা। প্লেটে নুড্‌ল্‌ জাতীয় কিছু। খাবারটা বোধহয় তেমন সুস্বাদু নয়। কাগজ পড়ার ফাঁকে একবার প্লেট থেকে কাঁটাটা তুলে আবার নামিয়ে রাখলো। কফির কাপটাও ঠোঁটে ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখছে।

"আসলে ছেলেটা ওর গার্ল ফ্রেণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে। গার্ল ফ্রেণ্ড এলে পছন্দসই খাবার এনে খাবে দু'জনে।"

"দূর! গার্ল ফ্রেণ্ড এলে তাকে নিয়ে কেটে পড়বে এখান থেকে," বললেন সান্যাল।

ফ্রান্সিস গম্ভীর মুখে বললেন, "একদম ঠিক কথা। নিজের নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করো। এমন কিছু সুদূর অতীত নয় ----।"

"নাঃ। মাত্তর ষাট বছর আগের ঘটনা সে সব।"

এদের বিশেষ বন্ধু রামমূর্তি মাস দুয়েক হল মারা গেছেন। তার আগে নিজেদের পঞ্চপাণ্ডব বলে ঠাট্টা করতেন এরা। রামমূর্তি আর মহান্তি বেনারসে সহপাঠি ছিলেন। ছাত্রজীবনের বহু দুস্কর্মের সঙ্গী দু'জনে। সেসব গল্প এঁরা অনেকবার শুনেছেন - রামমূর্তির মুখে মহান্তির কীর্তিকাহিনী এবং মহান্তির মুখে রামমূর্তির।

আজ মহান্তি সেই পুরোনো গাথার কিছু কিছু পুনরুল্লেখ করে আক্ষেপ করে বললেন, "এমন হঠাৎ চলে গেল যে 'গুডবাই'টুকুও বলার সুযোগ দিলো না।"

"আমরাও ডাক এলেই চলে যাবো।"

"হ্যাঁ। দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছি। এই দিনগুলো বোনাস বলে মনে করবে। এগুলো উপরি পাওনা।"

মিহি সুরে বাদ্যসঙ্গীত বেজে উঠলো কাছেই কোথাও। পাশের টেবিলের ছেলেটি মোবাইল বার করে কানে লাগালো। অস্ফুট স্বরে কিছু বললো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সমাগত চার বৃদ্ধ এক দৃষ্টে চেয়ে আছে যুবকটির দিকে। যুবকটিও এদের দেখলো। তারপর অলস ভঙ্গীতে হলঘরের ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তে মহাপ্রলয়ের সংঘাতে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেন তাণ্ডব ঘটে গেল।

তালুকদার, মহান্তি, সান্যাল ও ফ্রান্সিস পরে বহুবার এদিনের ধ্বংসলীলা নিয়ে আলোচনা করেছেন : উদ্যত মারণাস্ত্রের এত সন্নিকটে বসেও তাঁরা কোন পূর্বাভাস পেলেন না, সন্দেহের বাষ্পটুকুও মনে এলো না কারও ----। সেই বিশাল সংহারলীলায় অতগুলো কচি প্রাণ নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কে ভাবতে পেরেছিল অন্ধ নিয়তির শিকার হবে ঐ অপরিণতবয়স্কেরা যাদের জীবনে এখনও অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে।

চার বৃদ্ধের গায়ে বিপদের আঁচও লাগে নি। গোড়ার দিকে দারুণভাবে স্তম্ভিত হতচকিত হয়ে গেলেও সেটা কাটিয়ে উঠতে দেরী হয়নি তাদের। পুলিশ তাদেরই বয়ান অনুযায়ী আততায়ীর ছবি এঁকেছিল এবং সেই ছবি সর্বত্র বিলি করেছিল তাকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টায়। অকুস্থলে বয়ান দেবার অবস্থায় আর বিশেষ কেউ অবশিষ্ট ছিল না।